ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1080-1085
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.107

শামসুর রাহমান : বাতাসে বারুদ গন্ধ, বন্দি শিবির থেকে

ড. পীযূষ পোদ্দার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 03.03.2025; Accepted: 24.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Shamsur Rahaman, a dedicated poet in his life, wanted to understand the contemporary and the time in the socio-political context. Many of his poems have emerged from politics and mass struggle. Surroundings are the sounds of rural decay, the weariness of life, isolation, failure and corruption. He saw that during the liberation war, everyone wanted to run away and live, Unna's mother running like a forest deer with a newborn baby on her chest. During the liberation war, the determination to wrest freedom from the ruler was declared in the poem 'Bandi Shibir'. The strong voice of the poet against all inequality has been raised in this poem. Poet wrote dreams of liberation and freedom from our daily life.

***Key Words**:* War, Politics, Struggle, Isolation, Equality, Freedom.

সত্য প্রকাশ ও আত্মানুসন্ধানকেই লেখকের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান। আত্মস্মৃতিমূলক রচনা 'কালের ধুলোয় লেখা'র পূর্বলেখ অংশে এই আত্মানুসন্ধান ও সত্যপ্রকাশকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন তিনি। সত্যপ্রকাশ অর্থে শামসুর যুগ-কালের বাস্তবকেই বড় করে তুলে ধরেছিলেন। শিল্পের নন্দনবীক্ষার চেয়েও সাধারণের দিনযাপনের ব্যথাচিত্র তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছিল—

> "জীবনের যেখানে কিছু রঙ লেগেছে শুধু তাই বর্ণনা করেছ, অতিরিক্ত রঙ চাপানো থেকে বিরত থেকেছি। বড়ো মাপের লেখকদের কাছ থেকে শিখেছি, সত্য প্রকাশ এবং আত্মানুসন্ধানই হল লেখকের প্রধান কর্তব্য।"[১]

তবে নজরুল ইসলামের মত শামসুর বিদ্রোহী নন, ভেঙেচুরে সব গুড়িয়ে দিতেও চান নি। বিনম্র শ্রমে তিনি কেবল দেশকালের মানুষের যাপন কথাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

শামসুর রাহমানের লিখন শৈলীর মধ্যে এক ধরনের সহজতা ছিল যার দ্বারা পাঠক দ্রুতই প্রভাবিত হতেন। অসাধারণ কোনো চিত্র নয়, শহরের পথচারী, ভিক্ষুক, গাছ, বিভিন্ন দোকান, রাস্তার কুকুর, গ্রামের মাঝি, কাক সব নিয়ে গড়ে ওঠে শামসুরের কবিতা মহলের খিলান গম্বুজ। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে যে শিল্প সাহিত্য চর্চা চলছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি হাসান হাফিজুর রহমান, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলি, আহসান হাবিব প্রমুখ। এইসব কবিদের বেশিরভাগের প্রতিষ্ঠা চল্লিশের দশকে। আহসান হাবিবের 'রাত্রিশেষ' 'ছায়া-হরিণ', 'সারা দুপুর', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আধুনিক চিন্তনের অনুরণন আছে। সৈয়দ আলি আহসানের 'অনেক আকাশ', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত', 'সহসা সচকিত', উচ্চারণ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে নিসর্গের দ্যোতনা আছে। তাঁর কবিতাগুলিতে শব্দের উপর গুরুত্ব আরোপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে মনে রাখতে হবে কবিতায়

আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রয়োগ বিশেষভাবে ঘটেনি এই কবিদের কাব্যে। পাঁচ ও ছয়ের দশকে নতুন যুগের কথা, মানুষের যাপন-সংকটের কথা যে কবিরা তুলে ধরতে চাইলেন, তাঁদের মধ্যে শামসুর রাহমান অন্যতম প্রধান কবি।

শামসুর রাহমানের কবিতা রচনার সূচনাকালে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। এক বন্ধ্যা সময়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের মিথ্যার বেসাতি দেখতে দেখতে কবি অনুভব করেছেন সকলের 'মানস মৃত্যু ঘটে গেছে' তাই এখন অপেক্ষা শুধু 'দ্বিতীয় মৃত্যুর'। এক জটিল নিগূঢ় আলোড়নে আবর্তিত হতে হতেই বাংলার মানুষের স্বপ্ন, কামনা, ব্যথা-বেদনা, অধরা মাধুরীর বিচিত্র সুর নিয়ে তাঁর কাব্য রচনা। দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে তাঁর এক একটি কবিতা পঙ্‌ক্তি যেন দেশের জল-বাতাসের মতই গায়ে লেগে থাকে। বাংলার মাটি খাঁটি বলে মনে হয় না আর। বাংলার ভাটিয়ালি, জারি, সারি, বিচিত্র সজল শোভা হারিয়ে শহুরে নাগরিক সভ্যতার মেকি কেতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে বাংলার শ্যামলিম গ্রামগুলি।

> "যা কিছু মানুষের প্রিয়-অপ্রিয়, যা কিছু জড়িত মানব-নিয়তির সঙ্গে, সে সব কিছু আকর্ষণ করে শামসুর রাহমানকে, স্নিগ্ধ উপত্যকার প্রাচীন উদ্যান থেকে সূর্যোদয়ের ঝলমলে টিলায় কবি শুনতে পান চাবুকের তুখোড় শব্দ, কোনো নারীর আর্তনাদ, একটি মোরগের দীপ্ত ভঙ্গিমা।"[২]

বাংলাদেশের কবিতা চর্চায় প্রেমের নানাবিধ প্রকরণ অনেক ক্ষেত্রেই স্বদেশপ্রেমে আশ্রয় চেয়েছে। কবি শামসুর রাহমান যৌবনের দার্ঢ্যে, প্রেমিকের বিহ্বলতায় এবং তীব্র প্রতিবাদে স্বদেশকে আত্মীভূত করে নিয়েছেন। পাখি-পল্লবে-রূপে-রসে সাজানো আদি অকৃত্রিম বাংলার উপর যখন নেমে আসে শাসকের নির্মম কুঠার তখন কবি শামসুর মুক্তি কামনায় বিস্ফোরণোন্মুখ। পৃথিবীর রক্তাক্ত প্রতিবেদন রচিত হয় তার কাব্য পঙ্‌ক্তিমালায়। 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের পূর্বেই প্রকাশিত হয় 'নিজভূমে' (১৯৭০) কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'আসাদের শার্ট' প্রভৃতি কবিতায় বিপন্ন বর্তমানকে তুলে ধরেন। কবির হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী নিত্য আসা-যাওয়া করতে চাইলেও এক ধ্বস্ত সময়ের সূচীমুখ যন্ত্রণায়, যুদ্ধের আগুনে, মারীর তাণ্ডবে, প্রবল বর্ষায়, সন্ত্রাস রাঙানো সকাল সন্ধ্যায় ঘাতকেরা প্রবলভাবেই হানা দেয় কবির মনোলোকে। আর এই সূত্রে গড়ে ওঠে প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের সব আখরমালা, আসাদের শার্ট গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো উড়তে থাকে বাতাসে। আমাদের সব কাপুরুষতা, ভীরুতাকে দলিত করে ভীষণ পরিবর্তিত চারপাশে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।

'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার 'অরুণা প্রকাশনী' থেকে। স্বাধীন বাংলা আর সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কবির কাছে সমার্থক মনে হয়। প্রবল স্বপ্নময়তায় কবি প্রবেশ করেন দেশের রক্তাক্ত মানচিত্রে। একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলিতে শহর-স্বদেশ-সাধ-আহ্লাদ বন্দী হয়ে যায়। শত্রুর আক্রমণে তিনি ভীত হয়ে উঠলেও, পলায়ন মনোবৃত্তি তাঁর নেই। মনের মত শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না কবি, পারেন না মনের মত কবিতা লিখতে, শাসকেরা সব অধিকার হরণ করে। কিন্তু হৃদয়ের ভিতরে স্বাধীনতার জন্য যে কলতান ওঠে কোন রক্তচক্ষু শাসকই তাকে দমিত করতে পারেনা। কবি দেখতে থাকেন বস্তির দুরন্ত ছেলেটার হাতের মুঠোয় 'স্বাধীনতা' নামক শব্দটি জ্বলজ্বল করতে থাকে। চাঁদ, ফুল, পাখি ছেড়ে বিস্ফোরক সব আখরমালায় কবিতা রচনা করেন, হৃদয়ের গভীরতলে স্বাধীনতার জন্য বেজে ওঠে সপ্তসুর। স্বাধীনতার অমোঘ ইচ্ছাকে সমকালীন জনগণের জীবন সংকটের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা / তোমাকে পাওয়ার জন্যে / আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় / আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন।' চারপাশের খাণ্ডবদাহনে পুড়তে থাকে সাকিনা বিবি, সগীর আলি, কেষ্ট দাস, মতলব মিয়া; কবি জানেন এইসব দামাল দুর্দম মানুষের বলিদানের বিনিময়ে স্বাধীনতা অবশ্যই অর্জিত হবে, নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে স্বাধীন হবে বাংলাদেশ।

'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা সতেরোটি। প্রথম কবিতা কাব্যের নাম কবিতা 'বন্দি শিবির থেকে।' পৃথিবীর প্রতিকূলতা কবিকে কাঙ্ক্ষিত শব্দচয়নে বাধা দেয়। চাঁদ, ফুল, পাখি প্রভৃতি কাব্যিক শব্দ নিয়ে শাসকের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে জনগণকে উদ্দীপিত করবার কিংবা প্রতিবাদ জানাবার শব্দগুলি উচ্চারণ করবার অধিকার হরণ করেছে শাসকেরা। আর তাই কবির দেহ-মন জুড়ে অতৃপ্তি, অবসাদ। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে

কবি বার বার উচ্চারণ করতে চান, প্রত্যেক বাড়িতে, প্রতিটি রাস্তায়, শহরের অলিতে-গলিতে রঙিন সাইন বোর্ডে কবি লিখে দিতে চান প্রিয়তম বর্ণমালা স্বাধীনতা। বন্দুকের নল শাসন করতে চায়, কেড়ে নিতে চায় কথা বলবার অধিকার। শাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে শাসকেরা এক ভয়ের রাজত্ব কায়েম করতে চায়, কবিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায় অমর অক্ষর, প্রিয় বাচন স্বাধীনতা থেকে। তবে পৃথিবীর কোনো শাসকই চিরকাল মানুষের ইচ্ছাকে অবদমিত করে রাখতে পারেনি, কবির স্বপ্নে বাংলাদেশের প্রতি অণু-পরমাণুতে স্বাধীনতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। বন্দি শিবিরের অবরুদ্ধ গুমোট থেকে কবি যেন মুক্তির বাতাস নিয়ে আসেন, শোষণ যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে—

‘অথচ জানে না ওরা কেউ
গাছের পাতায়, ফুটপাতে পাখির পালকে কিংবা নারীর দু’চোখে
পথের ধুলায়
বস্তির দুরন্ত ছেলেটার
হাতের মুঠোয়
সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দ।’ (কবিতা সংগ্রহ, শামসুর রাহমান)

সময়ের গনগনে আঁচে চারপাশ যখন ঝলসে যেতে থাকে, সত্যের বলাৎকার আর নিরপরাধের রক্তে ভিজে যায় মাটি, তখন কবিকে উচ্চকণ্ঠ হতেই হয়, কবি আর্তনাদে দশদিক ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চান। রাস্তাঘাটে সকলকে প্রচ্ছন্ন ঘাতক মনে হয়। এমন হন্তারক সময়ে সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সন্ত্রাসতাড়িত দিন-রাত্রি থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে অনেকেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় খোঁজে, কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় অন্য কোথাও। কবি শামসুর বাজেয়াপ্ত দিনরাত্রি সঙ্গী করে যন্ত্রণা বিদ্ধ দেশবাসীর সঙ্গে দেশেই থাকতে চান। মৃত্যুর প্রতীক্ষাকে নিয়তি বলে মানা সাধারণ মানুষের চোখে স্ফুলিঙ্গ দেখতে চান, দেখতে চান প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে। কিন্তু কবির পরিপার্শ্ব জুড়ে কেবলই কুণ্ঠাহীন খুনী, ভ্রাতৃঘাতক, দালাল, মিরজাফর আর মোহম্মদী বেগদের ভিড়। অবাক বিস্ময়ে কবি দেখতে থাকেন মানুষ মারার বোমা-বারুদের সঙ্গে আসতে থাকে গুঁড়ো দুধ। এমন প্রহসন ও প্রহেলিকায় কূটনীতির কালো জোব্বা ও রক্তে লাল হয়ে ওঠে, বুটের তলায় পিষ্ট হয় দেশ, বেয়নেটে বিদ্ধ হয় মানবিক গুণাবলী। কৃষক মজুরদের উদ্দেশ্য করে কবি বলেন—

‘দুনিয়ার সব শৃঙ্খলিত কৃষক মজুর শোনো
সর্বহারা নিধনের জন্যে অবিরাম
আসছে বারুদ বোমা স্বৈরাচারী শাসকের হাতে,
কখনো-বা বলিহারি যাই, গুঁড়া দুধ।
খাসা কূটনীতি,
চিনা ও মার্কিন কালোয়াতি।’ (কবিতা সংগ্রহ, শামসুর রাহমান)

এই জান্তব রসিকতাকেও কেউ কেউ নিয়তি নির্ধারিত মেনে সুখে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করেন।

দেশবাসীর জীবনে অকাল সন্ধ্যা নেমে আসায় কবি শামসুরের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। ঘরদালান, রাস্তাঘাটময় কেবলই মৃতের ঘ্রাণ, নিরাপত্তা নেই কোথাও। তরুণী কন্যার হাত ধরে পিতা ঘরের চেয়ে বেশি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকেন। এই মৃত্যুপুরীতে পিতা মাতা আত্মজ ও আত্মজাকে নক্ষত্রবীথির আড়ালে রক্তকণিকার গহীনে লুকিয়ে রাখতে চান, কেননা প্রতিটি মুহূর্ত সর্বনাশের অপেক্ষায় সন্ত্রস্ত। মৃতের নগরী বলে মনে হয় চারপাশকে। সান্ধ্য আইনে নিথর আঁধার ঘরে বিপন্ন বিস্ময়ে সকলেই অবাক, আর সমস্ত শান্তি খান খান করে দিয়ে লুকানো অস্ত্রের খোঁজে শাসক শক্তি সব তছনছ করে দিয়ে যায়।

শামসুর রাহমান অস্ত্রে বিশ্বাসী নন। ব্যক্তিগত যাপনে তিনি মৃদু স্বভাবের, ছায়াময় আশ্রয়ে অস্তসূর্যের অস্তরাগে তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, ছোরা, ভোজালি, সড়কি, বল্লম, বন্দুক তার পৃথিবী নয়। গোলাপ আর চন্দনের ব্রতকথা তার স্বভাবজাত। অথচ দেশকাল আক্রান্ত হলে, তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ান সর্বতোভাবে। দেশ বা জাতির পতন

উত্থানের তিনি বাঙময় সঙ্গী। আক্রান্ত দেশকালে কবি নিজেই হয়ে ওঠেন নিজের অস্ত্র। তিনি দেখতে থাকেন শাসকের অহংকার আমাদের প্রিয় সব কিছু কেড়ে নেয়, ধ্বংস করে—

> ‘আমাদের প্রিয় যা কিছু সবই তো ওরা
> হত্যা করে একে একে। শহিদ মিনার
> অপবিত্র করে, ভাঙে মর্টারের ঘায়ে,
> ফারুকের সমাধিস্থ লাশ খুঁড়ে তোলে
> দারুন আক্রোসে।’ (কবিতা সংগ্রহ, শামসুর রাহমান)

হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালো না বাসলেও কবি বুঝেছিলেন এই যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনে তাঁর কোনো নিভৃত জীবন দেবতা নেই। তিনি প্রবেশ করলেন দেশের অন্তরে, দেশও যেন সমানভাবে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করল তাঁর অন্তরে। ধূসর শহর, অন্ধকার পল্লী, শস্য-শ্যামল গ্রামের শ্রী নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কবির কাছে স্বাধীনতা হয়ে ওঠে রবি ঠাকুরের ‘অজর কবিতা, অবিনাশী গান।’ ‘কবিতাভাবনা’ নামক প্রবন্ধে শামসুর রাহমান জানিয়েছেন—

> “... অনেকে বলেন রাজনীতি কবিতার বিষয় হতে পারে না। আমি সেটা মানি না। কেননা রাজনীতি তো প্রতিনিয়ত আমার জীবনকে স্পর্শ করছে। শুধু আমাকে নয়, আমার বংশধর, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমনকী সব শ্রেণির মানুষকে স্পর্শ করছে।... একজন কবি বা শিল্পীর দু ধরনের দায়বদ্ধতা আছে, এক তার শিল্পের প্রতি এবং সমাজের প্রতি। আমি কবিতার কাছে দায়বদ্ধ, আমি শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ। আমার এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমি লিখি।”[৩]

এই দায়বদ্ধতা থেকেই কবি উদ্যত অস্ত্রের সামনে প্রতিরোধ হিসাবে ব্যবহার করতে চান গ্রাম বাংলার আবহমান কালের জীবন যাপন, সাধারণ মানুষের স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাকে। ফসল ভর্তি মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষক, কিংবা পিতার জায়নামাজের উদার সুর, গৃহিনীর খোলা কালো চুল বা খুকীর তুলতুলে গাল সব মিলে মিশে বাংলাদেশের আবহমানকালের একটি উজ্জ্বল আর্থসামাজিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাসকে ধ্বংস করে যে শক্তি বাংলার চিরন্তন সৌন্দর্যকে, স্বপ্নকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে, জনসাধারণকে পদানত করে রাখে কবি ‘বন্দি শিবির থেকে’ কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বলেছেন যে কোন মূল্যেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। কবির চোখের সামনে দৈনিক দিনযাপনের চেনা দৃশ্যাবলি লুপ্ত হয়ে যায়। নিজেদের জ্ঞাতে কিংবা অজ্ঞাতে আমরা ক্রমাগত বদলে যেতে থাকি। অনেক ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কবি শামসুর রাহমান সমকালীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। আমাদের বসতির দেওয়ালগুলি এক একে ভেঙে পড়ে। কোনোদিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। আসলে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক করাল বেলায় কবি প্রত্যক্ষ করলেন সাধারণ মানুষ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। রক্তাক্ত বাস্তব প্রত্যক্ষ করে কবি গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করতে পারেন না। পথ ঘাট জনবিরল, হত্যাময় শহরে বিদেশীদেরই সংখ্যাধিক্য। এমন কালবেলায় কবির কাছে জ্ঞানার্জনকে বড়ো অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

বিষণ্ণ বিধ্বস্ত কবি শামসুর রাহমান ক্লান্ত মনে ঘুণ ধরার কথা বললেও আমরা জানি তিনি তীব্র প্রতিবাদে ফিরে আসবেন, দু’চোখে স্বপ্ন নিয়ে বলবেন স্বাধীনতার কথা। পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় যে মানুষগুলি রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, অসম্ভব প্রিয়তায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, তাদের স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। ভৌগোলিক মানচিত্রে বাংলাদেশের যে ছবি, তার আপামর জনসাধারণ এক বুক আশা নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে। দিনযাপনে প্রতিমুহূর্তে সব খোয়ানোর ভয় সকলকে গ্রাস করে, পিতা-মাতা তার আত্মজ ও আত্মজাকে নক্ষত্রবীথির অন্তরালে কিংবা রক্তকণিকার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চান। ঘরে-বাইরে শত্রু, মান-সম্মান, প্রাণ-মন সবই অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়। এমন চারপাশে সাধারণ মানুষ ভালো থাকতে পারে না, তারা একটাই স্বপ্ন দেখে, কবির কলমে তা উচ্চারিত হয় স্বাধীনতা নামে। স্বাধীনতা যেন বাংলাদেশের জনমানসের এক জাগ্রত স্বপ্ন। সব কিছুর বিনিময়ে, যে কোন মূল্যে স্বাধীনতাকে আসতেই হবে বাংলাদেশে, কবি জানাচ্ছেন-

'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।'
(তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা)

শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত জনমানসের করুণ ছবি কবি শামসুরকে ব্যথিত, বিষণ্ণ করে তোলে। সত্তর-একাত্তরের বাংলার জনমানসের ভাবনা চিন্তা, ব্যথা বেদনাগুলি কবিতায় বেদনাতুর হয়ে প্রকাশিত হয়। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি বাংলার উজ্জ্বল-মধুর চিত্র রচনা করেন। গভীর প্রিয়তর উপলব্ধিতে স্বাধীনতা মিলে যায় মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিকে, রোদেলা দুপুরে দস্যি গ্রাম্য মেয়ের পুকুরে অবাধ সাঁতারে, উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপনে, বোনের মেহেদি রঞ্জিত হাতের পাতায়, বাগানের ঘরে, কোকিলের গানে, শান্ত বটের ঝিলিমিলিতে। শুভ্র অনুভব কোমল দ্যুতিতে কবি যেন সমগ্র বাংলাদেশকে প্রকাশ করতে চাইলেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার সুখে মজুরের দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী মেতে ওঠে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

স্বাধীনতার পূর্বেকার বাংলাদেশে ভয়ংকর ত্রাস জাগানো পরিবেশে কবির মনে হয় ঢাকা শহরে বন্দী সব কবি এবং কবিতারা যেন বেরিয়ে পড়েছে স্বদেশের পথে পল্লীতে। এক দীঘল কালো কাকের অন্ধকার ডানা ঢেকে দিচ্ছে গ্রামবাংলাকে। মনুষ্য পদচিহ্ন বর্জিত গ্রাম্য পথ, রাখাল নেই, আলপথ খাঁ খাঁ, যেন ভয়ংকর এক মারণ ব্যাধির কবলে পড়ে উজাড় হয়ে গেছে গাঁয়ের পর গাঁ। 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যের 'কাক' কবিতায় কবি জানাচ্ছেন সেই ভাষ্য—

'গ্রাম্যপথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গরু
নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু
আল খাঁ-খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।'
(কাক/ বন্দি শিবির থেকে)

চার পঙক্তির কবিতার মর্মে কবি সাধারণ মানুষের জীবনের ভয়াবহতা প্রকাশ করলেন। শাসকের নির্মম আঘাতে গ্রাম বাংলার পথঘাট জনবিরল হয়ে পড়ে, এক মহামারীর রূপকে কবি 'কাক' শব্দটি ব্যবহার করেন। হুমায়ুন আজাদ 'শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা' গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ভাবে বলেছেন নগ্ন রৌদ্র ঝলসাচ্ছে, আর তার মধ্যে উৎফুল্ল কাকেরা ছিঁড়ে খাচ্ছে বাঙালির নয়, বাংলার মাংস-মজ্জা-নাড়ি। জনবসতিপূর্ণ বাংলার বসতিশূন্য হয়ে যাচ্ছে; অনেকে নিহত হয়েছে, পালিয়েছে কেউ। কবি শামসুর এই দমবন্ধ পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান না। এক ঘাতক পৃথিবীর আওতায় এসে যাবার পর সকলকেই যেন প্রচ্ছন্ন ঘাতক বলে মনে হয়। চেনা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে যাবার স্বাভাবিক অধিকারকেও স্বপ্ন মনে হয়। অসম্ভব রসিকতায় স্বৈরাচারী শাসক আনতে থাকে মানুষ খুন করবার বারুদ বোমা আবার জীবনদায়ী গুঁড়ো দুধ। বেয়নেটে বিদ্ধ হয়ে বয়ে যায় রক্তস্রোত, বুটের তলায় পিষ্ট হয় মানবিক সব অধিকার। খানখান হয়ে ভেঙে পড়া বাংলার এমন প্রাত্যহিকীতে কবির হৃদয়ে ফুঁড়ে যায় এক নাঙা তলোয়ার। ভ্রাতৃঘাতী, মাতৃঘাতী শাসকের সঙ্গে কেউ কেউ 'দোস্তি' জমায় 'নিবিড় মস্তিতে'। এমন খুনে সময়ে পলায়ন শ্রেয়তর হলেও কবি শামসুর অন্য কোথাও যেতে অস্বীকার করেন। বাজেয়াপ্ত দিনরাত্রি নিয়ে যেসব মানুষেরা যন্ত্রণাবিদ্ধ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকে কিংবা তিলে তিলে ক্ষয়ে যায়, ধ্বসে যায় জীবন থেকে, কবি তাদের শরিক হয়ে থাকতে চান।

সত্তর একাত্তরের সন্ত্রস্ত দিনগুলিতে সমগ্র বাংলাদেশই এক বন্দি শিবির হয়ে উঠেছে। কবি অভিজ্ঞতায় দেখেছেন আমাদের প্রিয়তম যা কিছু সবই ধ্বংস করে, হত্যা করে পশ্চিমী সেনা। 'মধুস্মৃতি', 'আন্তিগোনে', 'শমীবৃক্ষ' প্রভৃতি কবিতায় কবি জানিয়েছেন শাসকের মারণাস্ত্র যতই ভয়ংকর হোক তা কখনো ললাট থেকে নক্ষত্র খসাতে পারে না। ভাড়াটে গুণ্ডারা ভয় দেখাতে পারে, ঝলসিত নাঙা তলোয়ার হিংস্রতায় তীব্র হয়ে উঠতে পারে,

রক্তস্নাত বাংলায় মিরজাফরেরা মুচকি হাসলেও হৃদয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে ধারণ করে প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদে বিস্ফোরক হয়ে উঠবে। 'শমীবৃক্ষ' কবিতায় কবি প্রতিবাদী বাংলার প্রতিরোধী চিত্র অঙ্কন করেন।

'লুকানো অস্ত্রের লোভে ওরা বারবার
দেয় হানা মহল্লায় মহল্লায়, খোঁজে
শস্ত্রপাণি যত্রতত্র শমীবৃক্ষ
বাংলাদেশের হৃদয়ে হৃদয়ে
ঝলকিত। চোখগুলো গ্রেনেডের চেয়ে
বিস্ফোরক বেশী আর শূন্য কোটি হাত
যতটা বিপজ্জনক, ক্রুর মারণাস্ত্র নয় তত।'
(শমীবৃক্ষ/ বন্দি শিবির থেকে)

শমীবৃক্ষ এই মানুষদের জন্যই কবি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন, মৃত নগরীর গাছগাছালির পাতার আড়াল থেকে যে চোখে জ্বলে ওঠে, তা আশা দেয়, স্বাধীনতার কথা বলে, এ চোখ স্বজনের, সুজনের। শহরের, গ্রামের চেনা দৃশ্যাবলী লুপ্ত হয়ে এক রক্ত রঙের ক্যানভাসে অত্যাচারের দলিল চিহ্নিত হয়ে যায়। নাগরিক বা মানবিক অধিকার দাবী করতে পারেনা কেউ।

এই সময়ের অভিজ্ঞতায় কবি সাধারণ মানুষের প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। অধিকারহীন পথ হাঁটার গ্লানি কবিকে পীড়িত করে, ঘাড় নীচু করা তো শাসকদের সকল নির্দেশ মেনে নেওয়া, কবি খেদের সঙ্গে বলেন- '... এই মাথার ওপর/ আততায়ী শাসক সবার / আছে পাকাপোক্ত অধিকার। কেবল আমারই নেই।'

ঘাতকের পাকাপোক্ত অধিকার, দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলা অমানবিক স্বৈরাচার কবিকে নিজভূমে পরবাসী করে দেয়। দেশের মধ্যেই তিনি যেন এক বিষণ্ণ উদ্বাস্তু। আশেপাশে কেউ নেই। তবু সেই সংকটকালে বুকের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্নকে কবি লালন করেছেন; স্বপ্ন দেখেছেন ভালোবাসার মানুষ নিশ্চিন্তে নিঃশঙ্কভাবে পুকুর ঘাটে ঘড়া ভাসাতে পারবে, পিতা দাওয়ায় বসে হুঁকো টানবে, ভীষণ ভয় ধরানো বদলে যাওয়া চারপাশে আবার এক বদল ঘটবে। বন্দি শিবির হয়ে যাওয়া বাংলাদেশে গুপ্ত ঘাতক আর অনুসরণ করবে না অহরহ। সব ঘাতককে সরে দাঁড়াতে বললেন কবি, তিনি আর লাশ চান না, শিউলিফোটা সকাল চান, ভবিষ্যত প্রজন্মকে গোলাপে ভরিয়ে দিতে চান। বাতাসে বারুদ গন্ধ থাকা সত্ত্বেও 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যটি হয়ে ওঠে, একাত্তরের বাংলাদেশের অন্তর-বাহির, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় আতুর।

তথ্যসূত্র:

১। রাহমান, শামসুর, কালের ধুলোয় লেখা, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫
২। খান, অন্বেষা, ওপার বাংলার কবিতার নির্মাণ শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা,২০২৩, পৃ.৫৩
৩। সামন্ত, সুবল (সম্পা), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, শারদীয় ২০০৮, পৃ.২১
৪। আজাদ, হুমায়ুন, নিঃসঙ্গ শেরপা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০৪, পৃ.৩৩